বলিউডের হার্টথ্রব অভিনেতা তথা নৃত্যশিল্পী হেলেন অ্যানি রিচার্ডসন খানের জন্ম ১৯৩৮ সালে বার্মার রেঙ্গুনে। পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত হেলেনের বলিউডে অভিষেক হয় ১৯৫১ সালে। প্রায় ৫০০-র ওপরে চলচ্চিত্রে অভিনয় ও নাচের জন্য ১৯৯৯ সালে ফিল্মফেয়ার জীবনকৃতী সম্মান পান সেলিম খানের দ্বিতীয় স্ত্রী। 'সোলে', 'ডন'-এর মতো একের পর এক মাইলস্টোন তৈরি করা চলচ্চিত্রে অংশ নিয়ে ৫ বার সেরা সহ অভিনেত্রী মনোনীত হয়েছেন। সেরা সহ অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন একবার। হেলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও জেতেন ২০০৭ সালে।

শনিবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ ■ ৪১ বর্ষ ■ ১৮২ সংখ্যা

কর্মহীন ভারত

গত অক্টোবর মাসে ভারতে কর্মহীনের সংখ্যা ১৮ লক্ষ বেড়েছে বলে একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর মাসে ইপিএফও-তে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন খাতে বেসরকারি সংস্থাগুলির মোট ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মচারীর প্রাপ্য জমা পড়েছিল। কিন্তু অক্টোবর মাসে তা প্রায় ১৮ লক্ষ কমে হয় ৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার। কর্মচারীদের পাশাপাশি ইপিএফও-তে নথিভুক্ত সংস্থার সংখ্যাও প্রায় ৩০ হাজার কমে যায় ওই সময়ে। এই পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, দেশে কাজের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এজন্য শুধু করোনা এবং লকডাউনকে দায়ী করা ঠিক নয়। করোনাকালে হয়তো কর্মসংকোচন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। গত ৬ বছরে দেশে কাজের বাজার একটু একটু করে সংকুচিত হচ্ছিলই। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা প্রকাশ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। তাই করোনা ছোবল মারতেই ভারতের অর্থব্যবস্থার কঙ্কাল প্রকাশ্যে চলে এসেছে। অক্সফোর্ড ইকনমিক্সের ব্যালেন্স শিটের পূর্বাভাস অনুযায়ী, করোনার মেঘ কেটে গেলেও বিশ্বে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দেশের অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাদের মধ্যে ভারতের অবস্থা হবে সব থেকে ভয়াবহ। জিডিপি ক্রমশ সংকুচিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবে বোঝার উপায় নেই যে, ভারতের অবস্থা এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

নিয়মিত অর্থনৈতিক প্রকল্পের পর প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার দায়বদ্ধ বলে দাবি করা হচ্ছে। নানা রকম রঙিন পরিসংখ্যান দেখিয়ে এমন একখানা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে যাতে মনে হয়, ভারতের জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উলটো কথা বলছে। সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই। নির্মলা সীতারামন অর্থনীতির ছাত্রী। মেধাবীও ছিলেন। কিন্তু ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান হার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। মোদি জমানায় ভারতের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করে থাকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিশেষজ্ঞরাও বারবার দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের হার গোত্তা খেয়ে পড়ছে বলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিৎ ফেরেনি। এখন পরিস্থিতি এমনই যে, উন্নয়নের একাধিক সূচকে ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির থেকেও পিছিয়ে পড়েছে। কেন এমন হচ্ছে? কেন্দ্রীয় সরকার বা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তা বুঝতে পারছেন না, এমন কিন্তু নয়। অথচ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। মাত্র একমাসে ইপিএফও থেকে ১৮ লক্ষ কর্মচারী কমে যাওয়া কিংবা ৩০ হাজার নথিভুক্ত সংস্থা কমে যাওয়া থেকে স্পষ্ট, সমস্যা কতখানি তীব্র। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরিসংখ্যানের গোলকধাঁধায় দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে বারবার সেই সমস্যা সমাধান করা থেকে নজর ঘুরিয়ে রাখছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন কিংবা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমদের বিরুদ্ধে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির রোগনির্ণয় এবং তার সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের সমতুল যোগ্যতা যে নির্মলা সীতারামনের নেই, সেকথা স্বীকার করতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। এইসব মানুষ যখন ভারতের অর্থনীতির সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন তাঁদের কথা অন্তত মন দিয়ে শোনা উচিত মাননীয়া অর্থমন্ত্রীর। রাজনীতির ঘোলা জলে দেশের অর্থনীতিকে না ডুবিয়ে দায়িত্বশীল আচরণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কাম্য। সবাইকে সবজান্তা হতে হবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি কেউ কাউকে দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং সংঘ পরিবারের অর্থনীতির পণ্ডিতদের কাছে দেশের মৃতপ্রায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সঞ্জীবনী সুধা নাই থাকতে পারে। এতে লজ্জা বা গ্লানির কিছু নেই। সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানের অন্তর্নিহিত অর্থের পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা কতটা গভীর, কী তার চরিত্র, কীভাবেই বা তার সমাধান সম্ভব ইত্যাদি নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, নির্মলা সীতারামনদের নাগালের বাইরে থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধতা হৃদয়ংগম করে অর্থনীতির প্রকৃত পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেশ ও দশের কল্যাণসাধনে এগোনোয় মন দেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর ট্যাংকে সওয়ার হয়ে দেশপ্রেমের ফোটোশুট করা সহজ। কিন্তু খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনীতিকে বাঁচাতে না পারলে, মানুষের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে না পারলে দেশের বিপদ যে আরও বাড়বে, সেকথাও শাসকের উচিত স্মরণে রাখা। নাহলে সামনে ঘোর বিপদ।

অমৃতধারা

শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দুর্বল করে দেয়, তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল। দাঁড়ান এবং আপনার মধ্যেকার দৈবত্বকে চিনতে শিখুন। অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা কর না, তুমি যা করতে পার সেটা কর কিন্তু অন্যের উপর আশা কর না। সমাজ অপরাধীদের কারণে খারাপ হয় না বরং ভালো মানুষদের নীরবতার কারণে হয়। তারা একাই থাকেন, যাঁরা অন্যদের জন্য জীবিত থাকেন। একটি সময়ে একটিই কাজ কর এবং সেটা করার সময় নিজের সব কিছুই তার মধ্যে ব্যয় করে দেও। নিজেকে দুর্বল মনে করা সব থেকে বড়ো পাপ। সত্যকে হাজার আলাদা আলাদা উপায়ে বলা যেতে পারে, তারপরেও সব কিছু সত্যই থাকে। একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতি জানার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সেই রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান।

–স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৭৬৯

পাশাপাশি : ১। আরতি, নীরাজনা ৩। আকস্মিক বেগে আসে এমন, আকস্মিক ৫। কনকন করার অনুভূতি ৭। শ্রীকৃষ্ণ ৯। (পুরাণোক্ত কাশ্যপের পত্নী) দনুর পুত্র, অসুর, দৈত্য ১১। উগ্র বা রুক্ষ মেজাজ ১৪। মেঘ জাত শিলা, বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ১৫। উপঢৌকন, ভেট, সেলামি।

উপর-নীচ : ১। ভেড়াজাতীয় প্রাণীবিশেষ বা তার লোমজাত বস্ত্র ২। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্য পদ্ধতিবিশেষ ৩। পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ ৪। বৃত্তান্ত, গল্প, উপাখ্যান ৬। মোটা খুঁটি বা লাঠি ৮। কলহসংগঠক বলে খ্যাত দেবর্ষিবিশেষ ১০। সদ্ভাব, মনের মিল ১১। ব্যবসায়ী, বেনে, সওদাগর ১২। হিমালয়-পত্নী ও গৌরী জননী, স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ ১৩। বুদ্ধিমান, চালাক, সমঝদার।

সমাধান ■ ২৭৬৮

পাশাপাশি : ১। খরিদ ৩। রেশ ৫। হল্লা ৬। পরত ৮। তমাম ১০। পরব ১২। নাকারা ১৪। ধামা ১৫। রঙ্গ ১৬। লবঙ্গ।

উপর-নীচ : ১। খয়রাত ২। দহরম ৪। শাম্বর ৭। তবু ৯। বিনা ১০। পয়মাল ১১। বঙ্গভঙ্গ ১৩। কাতার।

বিহার মডেলের বাম রথ বাংলায় চালানো কঠিন

বিহারে বামেদের জয় আদতে সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের কৃতিত্ব। দুই মূল বামপন্থী দল সিপিএম বা সিপিআই এই নির্বাচনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। ২৯টি আসনে লড়ে বাম দলগুলি ১৬টি আসন পেয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি আসনে লড়াই করে ১২টি জিতেছে লিবারেশন। বাংলায় কিন্তু লিবারেশন কার্যত অস্তিত্বহীন। বলছেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলুন তো ভাই, বামফ্রন্ট সরকার ঠিক কী চাইছে? নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় এই প্রতিবেদককে প্রশ্নটা করেছিলেন সমাজকর্মী মেধা পাটেকর। তাঁর বিস্ময় ছিল, কৃষক আন্দোলনের মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা বামফ্রন্ট সরকার কেন এমন কৃষক-বিরোধী পথে হাঁটছে। সেদিন সেই যে পথ হারাল বাম আন্দোলন, তা আর খুঁজে পেল না। আজও তেমনই বিভ্রান্ত এবং দিশাহীন বাংলার বাম রাজনীতি। কাজেই বিহারে বামেদের উত্থান দেখে এরাজ্যে আলিমুদ্দিনের পালে হাওয়া টানার আশাভঙ্গই হবে হয়তো। তাছাড়া বিহার ও বাংলার বাম আন্দোলনের সাযুজ্য খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। বিহারে বামেদের ভূমিকার সঙ্গে বাংলার বামপন্থীদের কর্মকাণ্ডের অনেক ফারাক। বিহার নির্বাচনে আরজেডি, কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলির মহাজোটে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে কংগ্রেস। তেজস্বীর নেতৃত্বে আরজেডি নীতীশের দল এবং বিজেপির সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বামেদের। বাস্তবে বিহারে বামেদের জয় আদতে সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের কৃতিত্ব। ভারতের দুটি মূল বামপন্থী দল সিপিএম বা সিপিআই এই নির্বাচনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। ২৯টি আসনে লড়াই করে সমস্ত বাম দল মিলে ১৬টি আসন পেয়েছে, যার মধ্যে ১৯টি আসনে লড়াই করে ১২টি আসনে জিতেছেন লিবারেশন প্রার্থীরা।

এই সাফল্যের পিছনে মানুষের মনে নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ যেমন একটি কারণ, তেমনই আরেকটি প্রধান কারণ হল, লিবারেশনের কাজকর্মে মানুষের মনে প্রত্যাশার উদ্ভাস। রাজনীতির প্রাথমিক শর্ত যদি হয় সুখে-দুঃখে মানুষের পাশে থাকা, তাহলে সেই কাজে লিবারেশন সফল। বিজেপি যেমন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে, ঠিক একইভাবে লিবারেশন বিহারে মানুষের, বিশেষত দরিদ্র জনজাতির মাঝে কাজ চালিয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি সেকাজে নিয়োজিত তরুণ এবং সৎ বাম কর্মী। নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে লিবারেশনের এই চমকপ্রদ জয়ের পিছনে বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত, মনোনয়ন দেওয়ার সময় সততার প্রশ্নে লিবারেশন কোনওরকম সমঝোতা করেনি। মনোনয়ন পেয়েছিলেন তাঁরাই, জনমানসে যাঁদের যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ছিল। দ্বিতীয়ত, লিবারেশনের এই তরুণ প্রার্থীরা বাম আদর্শের টানে রাজনীতিতে এসেছেন বলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাবছর বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের লিপ্ত রাখেন। তৃতীয়ত, তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিপর্যস্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নীতীশ এবং বিজেপিকে একসঙ্গে কাঠগড়ায় তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

লিবারেশনের কয়েকজন প্রার্থীর জীবনপঞ্জির দিকে একবার চোখ রাখা যাক। যেমন মনোজ মঞ্জিল, দীর্ঘদিন ধরে বিহারের গ্রামাঞ্চলে বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বছর দুয়েক আগে 'সড়ক পে স্কুল' নামে আন্দোলন গড়ে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুল পরিকাঠামোর চেহারাটা সরকারের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট সত্যেন্দ্র যাদব বা সন্দীপ, সৌরভের মতো ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা নেতাদের বয়স চল্লিশের কোঠা ছাড়ায়নি। ছত্রিশ বছর বয়সি অমরজিৎ কুশওয়া সংযুক্ত জনতা দলের প্রার্থীকে হারিয়েছেন ২৫ হাজারেরও বেশি ভোটে। এঁরা প্রত্যেকেই সামাজিক আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন বিভিন্নভাবে। লিবারেশন এই নবীন এবং আদর্শনিষ্ঠ প্রার্থীদের নির্বাচনি ময়দানে নামিয়ে ভালো ফল পেয়েছে। নীতীশ সরকারের প্রতি মানুষের মনে ক্ষোভ ছিলই। কিন্তু বামেদের মূল শপথ ছিল, বিজেপিকে আটকাতে হবে। লিবারেশন লাগাতার প্রচার করেছে, দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ বিজেপির হাত ধরে হিন্দু মৌলবাদীদের উত্থান, বিজেপি দলিত, অনুন্নত শ্রেণি এবং সংখ্যালঘুদের সামনে এক মূর্তিমান বিভীষিকা এবং এই কর্মকাণ্ডে বিহারে বিজেপির প্রধান শরিক মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এই প্রচারে লিবারেশনের সাফল্য নির্বাচনি ফলে প্রমাণিত। নির্বাচনি ফলপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই বাংলার রাজনীতিতে বামেদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন লিবারেশন নেতৃত্ব।

দলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য পশ্চিমবাংলায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে অভিমত দিয়েছেন, তা বাংলার মাটিতে কতটা কার্যকর হতে পারে, একবার বুঝে নেওয়া যাক। মুখ্যত তিনি বলেছেন, বাংলাতেও বামপন্থীদের বুঝতে হবে, সামনে মূল প্রতিপক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টি, তৃণমূল নয়। দেশের কাছে এখন সবচেয়ে বড় বিপদ হিন্দু মৌলবাদী শক্তি। সুতরাং সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বামেদের জোটবদ্ধ হওয়াই কাম্য। দীপঙ্করবাবু মনে করেন, তৃণমূল এখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি, অল্পদিনের মধ্যে সরকার থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু বিজেপি তা নয়। এই দলটি পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে বামপন্থীদের নেমে পড়া উচিত। কিন্তু সিপিএমের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, মমতাকে আসনচ্যুত করা। এখানেই বিহারের কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে এরাজ্যের বামপন্থী নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। আলিমুদ্দিনের প্রবীণ নেতৃত্ব দীপঙ্করবাবুর কথায় সায় দেবেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন, লিবারেশনের পরামর্শ মেনে নেওয়া কার্যত আত্মহননের শামিল। বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করে যে তৃণমূল এরাজ্যে সরকারে এসেছে, সেই দলের কাছে মৈত্রীর বার্তা পাঠানো আর যাই হোক পশ্চিমবঙ্গের বামেদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সরকার বেদখল হয়েছে দীর্ঘদিন। আলিমুদ্দিনের শক্তিবৃদ্ধির এখনও কোনও ইঙ্গিত মিলছে না। বরং ক্রমেই বিধায়ক এবং প্রাক্তন জনপ্রতিনিধিরা সিপিএমের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছেন। বসিরহাটের সিপিএম বিধায়ক রফিকুল ইসলাম সম্প্রতি লাল জামা ছেড়ে সবুজ পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়েছেন। প্রাক্তন বিধায়ক স্বদেশরঞ্জন নায়েক গৈরিকবাস ধারণ করেছেন। অথচ এরাজ্যে বাম আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সিপিএমকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। কেননা, বিহারে সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও এরাজ্যে লিবারেশন কার্যত অস্তিত্বহীন। কিন্তু সমস্যা হল, গত কয়েক বছরে সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম পর্বে বামপন্থীরা সবচেয়ে বিপাকে পড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বামেদের আন্দোলনের প্রধান শর্তগুলি আত্মস্থ করে নেওয়ায়। মমতা দরিদ্র জনজাতির উন্নয়নের পক্ষে জোর সওয়াল করতে থাকলেন এবং সংখ্যালঘু স্বার্থ রক্ষা করতে ধর্মনিরপেক্ষতার শর্তটি দলের অ্যাজেন্ডার প্রথম সারিতে রাখলেন। ২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নতুন পথের সন্ধান করার চেষ্টাও করেননি বাংলার বাম নেতৃত্ব। বিহারের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক বলে সে রাজ্যের বামেরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। নীতীশ কুমার বিজেপির সহযোগী হওয়ায় বামেরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ আনার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে জনবিরোধী নীতির অভিযোগ আনতে পারল।

কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব আইন, কৃষি আইন বা পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে সরকার বিরোধী প্রচার তীব্র করেছিল বামেরা। লিবারেশনের প্রচারে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের নীতির তুলোধোনায় নীতীশকেও শরিক করা হল। প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিহার সরকারকে ওই সমস্ত অভিযোগের জবাব দিতে রক্ষণাত্মক খেলতে হল প্রায় আগাগোড়া। আত্মপক্ষ সমর্থনে বিজেপিকেও কম সময় ব্যয় করতে হয়নি। বিহারে যেসব ইস্যুতে প্রচারে জোয়ার এনেছে বামেরা, এরাজ্যে সেইসমস্ত ইস্যু মমতা হাইজ্যাক করে বসে আছেন। এখানেই বিহারের সঙ্গে এরাজ্যের বাম আন্দোলনের মূল পার্থক্য। এরাজ্যের বাম নেতৃত্ব মূলত ইস্যুহীন। সিপিএম নেতৃত্ব একসময় মনে করেছিলেন, ধীরে ধীরে তৃণমূলের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে এবং ফের বামেদের দিকে ঝুঁকবে। বাস্তবে তা হয়নি। সিপিএম এবং সহযোগীদের যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, তত শূন্যস্থান পূরণ করেছে বিজেপি। বিহারের সঙ্গে এরাজ্যের আরেকটি বড় পার্থক্য হল, বিহারে বামেরা বরাবরই বিরোধী পক্ষে। কিন্তু এরাজ্যে বামেরা দীর্ঘদিন সরকার চালিয়েছে। সরকার পরিচালনায় থাকলে যে কোনও শাসকদলের প্রশাসন নির্ভরতা বেড়ে যায়। ফলে দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এরাজ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি। ক্রমে আমআদমির সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন বাম নেতৃত্ব।

আবার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার লোভে বহু জনকল্যাণ বিরোধী প্রশাসনিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করে ফেলেছিলেন কিছু স্থানীয় নেতা। সে কারণে শীর্ষ বাম নেতৃত্বের অধিকাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তেমন অভিযোগ না থাকলেও প্রশাসনিক দুর্নীতি কমেনি। আবার বামেরা ধর্মনিরপেক্ষতার বর্ম পরে থাকলেও ধর্মের বাড়বাড়ন্ত কমেনি বিজ্ঞানচেতনার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি বলে। আলিমুদ্দিন মিছিলে যোগ দেওয়ার হুইপ জারি রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু ভাবাদর্শে কর্মী-সমর্থকদের জারিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে সামাজিক এবং প্রশাসনিক, দু'দিক থেকেই বাম আন্দোলন পিছিয়ে পড়ল। আরও একটি কারণে ধাক্কা খেয়েছে বাম আন্দোলন। তা হল প্রযুক্তি। টিভি এবং পরে সোশ্যাল মিডিয়া সমাজজীবনকে গ্রাস করতেই বাম আন্দোলন খাদের কিনারায় পৌঁছে গেল। যে বাম আন্দোলন বৈজ্ঞানিক চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলে, সেই আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রযুক্তির ব্যবহার না করায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক মানচিত্রে তেমনভাবে ঠাঁই করে নিতে পারলেন না। আসলে বিজ্ঞানচেতনাকে মৌখিকভাবে যতটা গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন বামপন্থী নেতারা, ততটা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেননি। প্রাথমিকস্তরে ইংরেজি বিদায় বা কম্পিউটারের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব থেকেই বোঝা যায় বামেদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার কতটা অভাব ছিল। এই ঘটনায় তাদের দূরদর্শিতার অভাবও টের পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান মানুষকে নতুন জ্ঞানের অধিকারী করে। কিন্তু সেই জ্ঞান ব্যবহার করতে আধুনিক মননের প্রয়োজন হয়। একথাটা বাম নেতৃত্ব বোঝেননি। সে কারণে যখন উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে বাড়িতে বাড়িতে টিভি ঢুকে গেল, তখনও বামেরা দলীয় বা আদর্শের স্বার্থে তার ব্যবহার শিখল না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে সিপিএম নেতৃত্ব এমন সব মন্তব্য করতে লাগলেন যা বিভিন্ন বৈদ্যুতিন চ্যানেলে নিত্যদিনের খোরাক হতে লাগল। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় সিপিএমের দাপুটে নেতা বিনয় কোঙার ক্যামেরার সামনে বলে দিলেন, প্রয়োজনে তাঁরা পুলিশ দিয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলবেন। প্রতিবাদের আগুন উসকে দিতে ওই একটি উক্তি যথেষ্ট ছিল। একই কাণ্ড ঘটেছে সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে। সোশ্যাল মিডিয়াকে বিজেপি যেভাবে কাজে লাগিয়েছে, তার কিয়দংশও বামেরা পারেনি। অন্তর্জালকে ব্যবহার করে বিজেপি ক্রমান্বয়ে বিরোধীদের কামান দেগে চলেছে। কংগ্রেস তা প্রতিরোধ করতে পারেনি। বামেরাও পালটা আক্রমণে যেতে পারেনি। বাম আন্দোলনের ধার কমে যাওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ, নবীন রক্তের আমদানির অভাব। এখনও আলিমুদ্দিনের শোভা বাড়াচ্ছেন পলিতকেশ নেতারা। সিপিএমের অন্দরে তাজা রক্তের আমদানি নিয়ে বহু কথা আগে হয়েছে। অথচ কাজের কাজ হয়নি। এখনও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষযাত্রায় হাঁটেন সেই অশীতিপর বিমান বসু বা বড়জোর সূর্যকান্ত মিশ্র।

যেসব নবীন কর্মী-সমর্থক একসময় সিপিএমে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরা বুঝেছেন নৌকা অন্য ঘাটে ভেড়াতে হবে। বামেদের তরুণ নেতৃত্বের একাংশ খোলা অর্থনীতির হাওয়ায় ভেসে গিয়েছেন। তাঁদের ধরে রাখার চেষ্টাও করেনি সিপিএম। তরুণদের মধ্যে প্রাণসঞ্চারে ব্যর্থ হওয়ায় বামপন্থী আন্দোলন পথ হারিয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে কিছুটা মান রক্ষা হতে পারে মাত্র। শৃঙ্খলাবদ্ধ দল হিসাবে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে মানুষের কাছে ফিরে যাওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে নবীনদের। বিজেপির হয়ে সকলের অন্তরালে এই কাজটাই করে চলেছে আরএসএস। সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে কখনও স্কুল, কখনও ক্লাব, কখনও হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে আরএসএস সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করছে। বিহারে লিবারেশনের কাজের ধারার সঙ্গে আরএসএসের সাযুজ্য আছে। তবে বাম কর্মীরা ধর্মীয় বৃত্তে মানুষকে টেনে আনছেন না। তাঁরা মানুষকে জীবন-জীবিকার মূল সূত্রগুলি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এরাজ্যে বামপন্থী তরুণ-তরুণীদের সে কাজে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা মিছিলে ভিড় জমাচ্ছেন দেখে আলিমুদ্দিনের ধারণা হচ্ছে, বামপন্থার দিকে ফের ঝুঁকছে যুবসমাজ। এই ধারণায় স্বচ্ছতা নেই। দৃষ্টিতে স্বচ্ছতা না থাকলে গর্জনই সার হবে, বর্ষণ আর হবে না।

> কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব আইন, কৃষি আইন বা পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে বিহারে সরকার বিরোধী প্রচার তীব্র করেছিল বামেরা। লিবারেশনের প্রচারে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের নীতির তুলোধোনায় নীতীশকেও শরিক করা হল। বিহারে যেসব ইস্যুতে প্রচারে জোয়ার এনেছে বামেরা, এরাজ্যে সেই সমস্ত ইস্যু মমতা হাইজ্যাক করে বসে আছেন। এখানেই বিহারের সঙ্গে এরাজ্যের বাম আন্দোলনের মূল পার্থক্য। বাংলায় বাম নেতৃত্ব মূলত ইস্যুহীন।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, কমছে ক্রয়ক্ষমতা

কোভিড পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতেও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধিনিষেধ জারি রয়েছে। লকডাউনে ভারতে প্রায় ১৩ কোটি ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। অন্যদিকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বহুগুণ বেড়েছে। কাঁচালংকা, আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি সবই নাগালের বাইরে। প্রায় ৭০ শতাংশের ওপর মানুষ স্বল্প আয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। মধ্যবিত্তের হেঁশেলে টান পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা দিশাহীন। জীবনদায়ী ওষুধের দামও বেড়েছে। সুগার, প্রেশার, থাইরয়েড, হার্ট ও অম্বলের বিভিন্ন ধরনের ওষুধ থেকে শুরু করে অ্যাসপিরিন জাতীয় সব ওষুধেরই দাম বেড়েছে। কম নয় অ্যান্টিবায়োটিকের দামও। এটা অবশ্যই বলা যায় যে, এখন মানুষকে বাঁচতে হলে খাবারের মতো ওষুধেরও প্রয়োজন। আবার এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা একবেলা না খেয়েও থাকতে পারবেন, কিন্তু একবেলা ওষুধ না খেলে চলে না। অনেক ক্ষেত্রে যমদূত আর বৃদ্ধ মানুষের মাঝখানের বাধাই হল ওষুধ। দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসছে, ওষুধ তখন আর্থিক কারণে রোগীর নাগালের বাইরে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই কঠিন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী? রাষ্ট্র না পারছে ওষুধের দাম কমাতে, না পারছে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, খিদে যখন পেটের খুব কাছে, খাবার তখন পেট থেকে বহু দূরে। কিছু মানুষ তো ঠিকই করতে পারেন না যে, সামান্য আয়ে আগে খাবার কিনবেন, না আগে ওষুধ কিনবেন! বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সরকার পারছে না। সরকার না পারছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে, না পারছে জিনিসের দাম কমাতে। বাস্তব পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, মানুষের চেয়ে সরকার নিজেই বেশি করোনা সংক্রামিত হয়েছে। প্রশ্ন হল, সরকার নিজেই যদি ভেন্টিলেশনে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষকে অক্সিজেন জোগাবে কে? সাধারণ মানুষই বা যাবেন কোথায়? আবার এই প্রশ্নও মানুষ করছে যে, এই মহামারিতেও সরকার যদি নাগরিকের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তাহলে আর কবে দায়িত্ব পালন করবে?

সনাতন পাল
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ত্রিভাষা সূত্র প্রসঙ্গে কিছু কথা

১৩ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত 'দাবি আদায়ে ঐক্য প্রয়োজন' শীর্ষক চিঠিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অবশ্যই দাবি আদায়ে ঐক্যের প্রয়োজন। তবে পত্রলেখক এক জায়গায় লিখেছেন, আঞ্চলিক ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করা কতটা সুবিধাজনক বা যুক্তিগ্রাহ্য, তা ভাবার বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান ভারতীয় রেল সব থেকে বেশি সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ করে। রেলের পরীক্ষায় ২০০৯ সাল থেকে আঞ্চলিক ভাষাতেও প্রশ্ন হচ্ছে। রেলের পরীক্ষার নিয়ম হল, পরীক্ষা যে রাজ্যে হবে, সেই রাজ্যের ভাষার সঙ্গে হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রশ্ন হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা সমস্ত ভারতীয় স্বীকৃত ভাষায় হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারি অন্যান্য সংস্থার আঞ্চলিক ভাষায় প্রশ্ন করতে অসুবিধা কোথায়? ভারতীয় রেল ১১ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় এবং অন্যান্য রাজ্যে তাদের নিজেদের ভাষায় প্রশ্নপত্র করে আসছে। তাহলে সবার দাবি থাকলে অহিন্দিভাষী রাজ্যে প্রশ্নপত্র আঞ্চলিক ভাষায় করার কোনও বাধা নেই। পত্রলেখক লিখেছেন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলিতে ৯৯ শতাংশ হিন্দিভাষী। এটা ঠিক নয়। দক্ষিণের রাজ্যে এবং ওড়িশা ও অসমে হিন্দিভাষী কর্মীর সংখ্যা ২০ শতাংশের বেশি নয়, বরং অনেকক্ষেত্রে কম। আর ত্রিভাষা সূত্র শুধু অহিন্দিভাষী রাজ্যে কার্যকর হবে কেন, হিন্দিভাষী রাজ্যেরও ত্রিভাষা সূত্র কার্যকর করা উচিত। কারণ, এই সূত্র সারা ভারতের জন্যই ভাবা হয়েছিল। দক্ষিণ ভারত ত্রিভাষা সূত্র মানে না। অহিন্দিভাষী প্রার্থীরা কেন নিজ ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবেন না? সবারই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।

কৃষ্ণা চক্রবর্তী ঘোষ, মিলনপল্লি, শিলিগুড়ি।

ছাত্রজীবনে পারিবারিক সমস্যা

ছাত্রজীবন প্রত্যেকটি ছাত্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ, এই সময়ের ওপর ভিত্তি করেই একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কিন্তু এই জীবনে ছাত্রদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম পারিবারিক সমস্যা। পরিবারকে ছাত্রদের প্রথম স্কুল হিসেবে ধরা হয়। কারণ পরিবার থেকেই ছাত্ররা প্রথম শিক্ষালাভ করে। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক সমস্যা একটি অন্যতম সমস্যা। বিশেষ করে দেখা যায়, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী সময়ে পরিবারের কিছু দায়িত্ব পালন করার কথা ভাবতে হয় এবং কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিবারের দায়িত্বও নিতে হয়। আবার অনেকে নিজের পড়ার পাশাপাশি টিউশন করেও নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যান। আবার অনেক মেধাবী ছাত্র পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে নিজের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। তাই সরকারের উচিত, উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের প্রতি নজর দেওয়া, কারণ একটি দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষিত ও সুদক্ষ নাগরিকের ওপর নির্ভর করে।

চন্দন কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।